বন্ধ কারখানা, বন্ধ কারখানার জমি, শ্রমিক-স্বার্থ ইত্যাদি প্রসঙ্গে শিল্পমন্ত্রী তথা পার্টির বক্তব্য ও আমাদের জবাব

শিল্পমন্ত্রী শ্রী নিরুপম সেন নানান সময় বলছেন রাজ্য সরকার বন্ধ কারখানার পড়ে থাকা জমিতে নতুন শিল্প গড়তে চান, কিন্তু নানান আইনী জটিলতার কারণে পারছেন না। তিনি বলছেন রুগ্ন শিল্প সংক্রান্ত আইন, বি এফ আই আর, এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, কোম্পনী আইন, ইত্যাদি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর ফলে লিকুইডেশনের মামলাগুলো বহু বছর ধরে চলে। বিনিয়োগকারীরা এতদিন বসে থাকতে রাজি নয়। তাই নতুন করে জমি অধিগ্রহণ করতে হচ্ছে।

এইখানে দেখা যাচ্ছে বন্ধ বা রুগ্ন শিল্পসংস্থার বিষয়ে কিছু তথ্য তিনি গোপন করছেন। রাজ্য সরকার 'ওয়েবকন'কে দিয়ে মূলতঃ বড় ও মাঝারি ৫০০টি বন্ধ, রুগ্ন এবং দুর্বল শিল্প সংস্থার ওপর একটা সমীক্ষা করিয়েছিল। ২০০৪ সালে তার প্রাথমিক প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা পড়ে। সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে ওই সংস্থাগুলিতে উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ ৪১,০৭৮ একর। ওই সমীক্ষার ফলাফল দেখিয়ে দলের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী এবং সর্বভারতীয় সম্পাদক শ্রী প্রকাশ কারাত ওই জমিগুলি অধিগ্রহণের ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে বলেছিলেন।

দলের পরামর্শ অনুযায়ী ২০০৪ সালে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্টে' ১৪-জেড ধারাটি সংযোজিত হয়। এই আইনের উদ্দশ্য হিসেবে ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন আটকে থাকা এই জমি উদ্ধার করে শিল্প-পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই জমি ব্যবহার করা হবে। শিপমন্ত্রীও সেদিন একই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন যে জমি বিক্রির অর্থ যাতে শিল্প পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় সেজন্যই এই আইন। শিল্পমন্ত্রী শ্রী নিরুপম সেন এখন আর এই সব কথা বলেন না। কারণ উদ্ধারকরা জমি নিয়ে এই সরকার এ পর্যন্ত যা করেছে তা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে পড়ে। যা নিয়ে রীতিমত তদন্ত হওয়া দরকার। উদ্ধার করা জমি কারখানার মালিককেই ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে নামমাত্র মূল্যে। সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে সেই জমি বিক্রয়ের আইনি অধিকার যাতে সেই জমি দশ থেকে কুড়ি কী ত্রিশ-গুণ দামে বেচতে পারে! একটুও বাড়িয়ে বলা কথা নয় এটা। খোঁজ নয়ে দেখুন বাটা আর হিন্দুস্থান মোটরসের জমি নিয়ে কী করা হয়েছে।

অনেকের মনেই প্রশ্ন তা কী করে সম্ভব? কারখানার জমি সরকার নেবেই বা কী ভাবে আর কারখানার মালিককে দিয়ে দিলে সে বেচবেই বা কীভাবে? আসুন সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া যাক ব্যাপারটা। সাধারণভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিল্পপতিরা সরকারের কাছ থেকে জমি (ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত) পেয়ে থাকেন 'লিজহোল্ড ল্যান্ড' হিসেবে। এজন্য তারা সরকারকে খাজনা দেন। সেই জমি ব্যবহার না করে ফেলে রাখলে, তা সে চালু কারখানার উদ্বৃত্ত জমি হোক বা বন্ধ কারখানার জমিই হোক, সরকার চাইলে সে জমি ফিরিয়ে নিতেই পারে। এটাকে আইনি ভাষায় বলে 'রিজিউম'বা resume-করা।

এই 'রিজিউম'বা resume-করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আগেও ছিল। এবার ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট সংশোধন করে সেই জমিকে 'লিজহোল্ড ল্যান্ড' থেকে 'ফ্রি-হোল্ড ল্যান্ড' করে মালিককে ফিরিয়ে দেবার এক্তিয়ার নিয়ে নিল। 'লিজহোল্ড ল্যান্ড' বলে এতদিন কারখানার বাড়তি জমি মালিকরা বেচতে পারতো না। এবার সে সেই অধিকার পেয়ে গেল! 'জনস্বার্থে'র নামে কী অনবদ্য উদ্যোগ!! সংশোধনী হিসেবে আনা ১৪-জেড ধারা দিয়ে এই কর্মটিই করছেন এই 'শ্রমিক দরদী সরকার'।

এই আইন সংশোধনের উদ্দেশ্য হিসেবে নিরুপমবাবুরা শিল্প পুনরজ্জীবিত করা, শ্রমিকের বকেয়া প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া, ইত্যাদির মত ভাল ভাল কথা বলেছিলেন। কিন্তু কার্যত কী করা হচ্ছে? দেখা যাচ্ছে জমি যা উদ্ধার করা হচ্ছে সেটা পছন্দের ব্যবসায়ী-প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে 'ফ্রি-হোল্ড ল্যান্ড' হিসেবে।
এই আইন সংশোধনের সময় বলা হয়েছিল
* জমিটির একটি সংরক্ষিত মূল্য ঠিক করা হবে।
* 'রিজিউম'-করে উদ্ধার করা জমি প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।
* জমি বিক্রির উদ্দেশ্য হবে শিল্পটির পুনরুজ্জীবন এবং শ্রমিক কর্মচারীর বকেয়া প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া।
* জমিটি 'ফ্রি-হোল্ড ল্যান্ড' হবে অর্থাৎ ক্রেতাকে জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হবে।

আইনটি হবার পর চার বছর কেটে গেছে। প্রায় ত্রিশটি সংস্থার জমি পুর্নদখল (রিজিউম)-করার এবং বিক্রয় করার অনুমতি পেয়েছে সরকার। আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। নিরুপমবাবুরা দেখাতে পারবেন না যে ত্রিশটির মধ্যে একটি ক্ষেত্রেও জমি বেচার টাকায় শিল্পসংস্থাটির পুনরুজ্জীবন হয়েছে। শিল্পের জমিতে শিল্প হবে এই নীতির উপর ভিত্তি করে এই আইন সংশোধনের পক্ষে সওয়াল করে শ্রী প্রকাশ কারাত মহাশয় পিপলস ডেমোক্রেসিতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

সেসব কথা এনাদের আর কারো মনে নেই। প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে তার নমুনা দেখুন, যা রাজ্যের মানুষের কাছে চেপে যাচ্ছে সরকার।

এক। হিন্দুস্থান মোটরস কারখানার মোট জমি ৭৩৯ একর। এর মধ্যে পড়ে থাকা ৩১৪ একর জমি ২০০৬ সালে রাজ্য সরকার 'রিজিউম' করলেন। ওই জমি ফের হিন্দমোটরস কর্তৃপক্ষকেই ফিরিয়ে দেওয়া হল। মাত্র ১০.৫ কোটি টাকায়। কিছুদিন বাদে এই জমি হিন্দুস্থান মোটরস কর্তৃপক্ষ ফের বেচে দিল শ্রীরাম প্রপার্টিস নামের একটি সংস্থাকে ২৯৫ কোটি টাকায়! কতগুণ লাভ হল? এখানেই শেষ নয়। লুকিয়ে জমির চরিত্রও বদলানো হল। জমিটির এক তৃতীয়াংশ জলাভূমি। সেটা ভরাট চলছে। রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তর এই বে-আইনি জমি ভরাটের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছিল এবং ভরাট করা সাড়ে তিন একর জমি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সে নির্দেশ মানার কোনো উদ্যোগ দেখা যায় নি কোনো তরফেই।

বরং সরকারের অনুমতিতেই দেখা যাচ্ছে শ্রীরাম প্রপার্টিজ ৬০ একর জমিতে 'আই-টি সেজ' গড়বে বলছে। বাদবাকি অংশে হবে বহুতল আবাসন ও শপিং মল। স্থানীয় মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। বলছেন ওই জলাটি স্বাভাবিক নিকাশি ব্যবস্থার প্রাণ। ওই অঞ্চলের ফুসফুস। কিন্তু এই প্রতিবাদে কান দিচ্ছে না কেউই।

দুই। বাটা নগরে বাটা ইন্ডিয়ার উদ্বৃত্ত ২৬২ একর জমি 'রিজিউম' করা হল। সেই জমি ফের বাটাকেই দিয়ে দেওয়া হল মাত্র ১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকায়! সেখানে আবাসন হবে। সেখান থেকে কত লাভ করবে বাটা-মালিক?

দুটির কোনো ক্ষেত্রেই আইন মোতাবেক নিলামের ব্যবস্থা হয়নি এবং নিয়ম মাফিক সংরক্ষিত মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়নি। এখন এটা পরিস্কার যে শিল্প, শ্রমিক-স্বার্থ, জনস্বার্থ ইত্যদির দোহাই পেড়ে আসলে সরকারি জমি বেসরকারিকরণই ছিল আসল উদ্দেশ্য। আর এজন্য বেশ গুছিয়েই করা হয়েছিল গোটা ব্যাপারটি।

এর পর কী বলবেন শিল্পমন্ত্রী শ্রী নিরুপম সেন মহাশয়? এর পরও রাজ্য সরকারকে বলতে হবে শিল্প-বান্ধব? আর এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন যারা তারা হলেন ষড়যন্ত্রী 'ওরা'?

পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ কারখানার সংখ্যা কত?

সম্প্রতি চব্বিশ ঘন্টা ধরে চলা নিউজ চ্যানেলে শিল্পমন্ত্রী বলেছেন, 'কিছু মানুষ বলেন পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার কারখানা বন্ধ। আসলে বন্ধ ৩৪৩টি কারখানা।' এইখানে একটা হিসেবের কারচুপি আছে। পশ্চিমবঙ্গের সব কল-কারখানা ও উৎপাদনী সংস্থা কেবল ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্টে নথিভুক্ত এমন নয়। বরং এর বাইরেই রয়েছে বেশিরভাগ সংস্থা। কিন্তু মন্ত্রী মশাই হিসেব দেবার সময় এদের মধ্যেকার বন্ধের হিসেবটা আর ধরছেন না। সরকারি তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের হরেক রকম শিল্প সংস্থার হিসেবটা দেখুন:

১। পশ্চিমবঙ্গে মোট ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা ৭,৭১,৩৮৮। এর মধ্যে ৪২,১৪৮টি ইউনিট রেজিষ্ট্রিকৃত। বাকি ৭,২৯,২৪০টি রেজিষ্ট্রিকৃত নয়। (সূত্র: থার্ড সেনসাস অফ এস এস আই সেক্টর, ২০০০-০১)

২। পশ্চিমবঙ্গে অসংগঠিত ক্ষেত্রে (উৎপাদনী) গ্রাম-শহর মিলে ২৭ লাখ সংস্থা আছে। সেখানে ৫৮ লাখ শ্রমিক কাজ করেন। (সূত্র: ন্যাশানাল স্যাম্পেল সার্ভে ২০০০-০১)

৩। আমাদের রাজ্যে শিল্প/কারখানা রেজিস্টার্ড অফ ফ্যাক্টরিজ আইন বা স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ আইনে নথিভুক্ত হতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্টে নথিভূক্ত সংস্থা ১৪০০০। (সূত্র: লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল)।

এর মধ্যে রিপোর্টেড বন্ধ কারখানার উল্লেখ করে রাজ্যে মোট বন্ধ সংস্থার হিসেব দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা সংখ্যাতত্বের জালিয়াতি। অন্যদিকে নথিভুক্ত কারখানা বলে রাজ্য সরকার যে সংখ্যা হাজির করে তা আসলে 'জীবিত' কারখানা -যা সংখ্যায় মাত্র ৬১০৩টি। অর্থাৎ প্রায় আট হাজার কারখানার আজ কোনো অস্তিত্বই নেই। (সূত্র: অ্যানুয়াল সার্ভে অফ ইন্ডাস্ট্রিজ)

৪। পশ্চিমবঙ্গে রুগ্ন ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা ৫০,৫৯৭টি। এবং বন্ধ সংস্থা ২৬,০৮০টি। (সূত্র: থার্ড সেনসাস অফ এস এস আই সেক্টর, ২০০০-০১)।

সি পি আই এম-এর ইশ্‌তেহারে শ্রমিক

সিপিআইএম-এর ২০০৯ সালের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে ৩২ পাতার মধ্যে ৩০ লাইন শ্রমিকদের জন্য খরচ করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গে মানবাধিকার শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৩২ বছর ক্ষমতায় থেকেও যে দল শ্রমিকের আইনী অধিকার, ন্যায় সঙ্গত প্রাপ্য আদায়ের সম্পর্কে উদাসীন তাঁদের মুখে মানবাধিকার রক্ষার কথাটি মানায় কিনা ভেবে দেখার। ইশ্‌তেহারে উল্লিখিত কয়েকটি অঙ্গীকার এবং সে ব্যপারে তাদের বর্তমান ভূমিকা তুলে ধরা হল।

১। ইশ্‌তেহারে বলা হয়েছে ‘পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুনর্বিবেচনা করা হবে।’

এখানে বলা দরকার পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারণ করতে হত দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ ২৪০০ ক্যালরি ধরে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫৫টি কাজের ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারণ করেছে দৈনিক ২২০০ ক্যালরি ধরে। রাজ্য শ্রম সম্মেলনের এই সুপারিশ মানায় সরকারের কোনো বাধাই ছিল না। এই সুপারিশ তো মানা হয়ই নি, এখন আবার সারা দেশ সম্পর্কে নীতির কথা শোনাচ্ছে সেই সিপিআইএম পার্টি।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারণ করা এবং অবশ্যই তা লাগু করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেই যেখানে সব কাজের ন্যূনতম মজুরি ঠিক করা হয়নি বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাড়ানো হয় না, বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে কমিয়ে দেওয়া হয় এবং বহু ক্ষেত্রে ঘোষিত মজুরিও দেওয়া হয় না -সেখানে মজুরি পুনর্বিবেচনার প্রতিশ্রুতির কোনো দাম আছে কী?

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি উৎপাদনে দেশের মধ্যে প্রথম এই সাফল্যের ঢালাও প্রচার চলে, অথচ কৃষি শ্রমিকদের মজুরি নির্দ্ধারণে দিল্লী সহ অনেক রাজ্যই অনেক এগিয়ে। দিল্লীতে দৈনিক মজুরি ১৫১ টাকা, উত্তরপ্রদেশে ১০০ টাকা, পাঞ্জাবে ৯৪.৬১ টাকা, ওড়িষ্যায় ১০০ টাকা, রাজস্থানে ১০০ টাকা, হরিয়ানায় ১৪৭ টাকা, বিহারে ৯১.৭৭ টাকা, আর সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৮০.৭৪ (১।১০।২০৮ সালে সংশোধিত হয়ে)।

এ তো গেল পশ্চিমবঙ্গে কৃষি মজুরদের ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারণের প্রশ্ন। এর পর আছে ঘোষিত মজুরির কত কম তারা পান তার প্রশ্ন। অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটি অসংগঠিত শ্রমিকদের সম্পর্কে এক ভয়াবহ সত্য তুলে ধরেছে। বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ৯৫.৪ শতাংশ কৃষি মজুর জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্পে ৬৬ টাকার (তখনকার নির্দ্ধারিত মজুরি) বদলে পুরুষরা ৪৫ টাকা এবং মহিলারা ৩০ টাকা পেয়েছেন।

লক্ষণীয় হল ন্যূনতম মজুরি আইন একমাত্র শ্রম আইন যা ভঙ্গ করলে রাজ্য সরকার আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন। এতে জেল, জরিমানা দুটোই হতে পারে। এ রাজ্যে ৩৪১টি ব্লকে ন্যূনতম মজুরি ও শ্রম আইন কার্যকর করা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিথিলতা থাকলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ৩৪১ জন ইনস্পেক্টর রয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হল মজুরি আইন ভঙ্গের ঘটনায় বিগত বিশ বছরে একজনের বিরুদ্ধেও কী রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে? -না, নেয় নি। পশ্চিমবঙ্গে এখনও চট, সুতোকল, চা-শিল্পে সরকার ঘোষিত নির্দ্ধারিত ন্যূনতম মজুরি মেলে না। এই বে-আইনি কাজটি ট্রেড ইউনিয়নগুলির সম্মতি নিয়ে চলে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৪ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক আছে এবং তাদের সরকার নির্দ্ধারিত হারে ১০০০ বিড়ি বাঁধলে ১২৪.৮২ টাকা পাওয়ার কথা (৩১/৮/২০০৮)। কিন্তু কখনই তারা এই হারে মজুরি পান না।

জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চিত প্রকল্পে (এন আর ই জি এ) এক’শ দিনের কাজ করে যে দৈনিক মজুরি পাওয়ার কথা সেটা নির্ভর করে সেই রাজ্যের কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির ওপর। যেহেতু আমাদের রাজ্যে কৃষি মজুরির হার অন্য রাজ্যের তুলনায় কম -সেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া এই অর্থ থেকে এন আর ই জি এ-র শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

২। ইশ্‌তেহারে বলা হয়েছে ‘---অস্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্নে নিরুৎসাহিত করার অবস্থান নেওয়া হবে।’

এখানে ‘নিরুৎসাহিত করা’ কথাটার অর্থ বোঝা দায়। -বিশেষকরে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে সরকারের নিজেদের পরিচালিত সংস্থাই বছরের পর বছর এই ধরণের ঠিকা ও অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগে উৎসাহ জুগিয়ে চলছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে দেশে চালু শ্রম আইনগুলির মধ্যে এগারোটি আইন চালু করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এর মধ্যে আছে ন্যূনতম মজুরি আইন, ঠিকা মজদুর আইন, সমকাজে সমবেতন আইন, শিশু শ্রমিক আইন, অভিবাসী শ্রমিকদের আইন, শিল্প বিরোধ আইন, ইত্যাদি।

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গে শ্রম আইন কার্যকর করার একটি নমুনা
* প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়া : চটশিল্পে ২০০৮ সালে ১৫০ কোটি টাকা (১৯৮০ সালে ছিল ৫ কোটি টাকা)
* প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়া : সব শিল্প মিলে ২০০৮ সালে ৫০০ কোটি টাকা
* গ্রাচুইটি বাবদ বকেয়া : চটশিল্পে ২০০৮ সালে ৩০০ কোটি টাকা
* ই এস আই বাবা বকেয়া : ২০০৮ সালে ১৩০ কোটি টাকা

ভারতীয় দন্ডবিধির ৪০৫/৪০৯ ধারায় পিএফ বকেয়াকারীদের বিরুদ্ধে শয়ে শয়ে অভিযোগ পুলিশের কাছে জমা পড়েছে। রাজ্য সরকার কোনো ক্ষেত্রেই শ্রম আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তকারী ভূমিকা নেয় নি।

৩। ইশ্‌তেহারে বলা হয়েছে ‘মৎস্যজীবিদের স্বার্থে বিশেষ কল্যাণ পর্ষদ গঠন করা হবে।’

ইশ্‌তেহারে এটা বলা হয়েছে। কিন্তু কী করছেন সেই সিপিএম সরকার?

এক, জম্বুদ্বীপ থেকে মৎস্যজীবিদের উচ্ছেদ করেছে এই সরকার।

দুই, নয়াচর থেকে মৎস্যজীবিদের উচ্ছেদ করার প্রকল্প গ্রহণ করেছে এই সিপিএম সরকার।

তিন, মন্দারমণির উপকূলে বেআইনি পর্যটন কেন্দ্র হতে দিয়েছে সিপিএম সরকার যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ঐ উপকূলের মৎস্যজীবিরা।

চার, কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট জোন থেকে কোস্টাল রেগুলেটরি জোনে পরিবর্তনের কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বাধা দেয়নি। সিপিএম।

পাঁচ, নয়াচরে কেমিক্যাল হাব বানাতে গিয়ে সিপিএম সরকার কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট জোনের বিধি নিষেধ ভঙ্গ করবে। অথচ লিখছে উপকূলীয় কর্তৃপক্ষ এলাকা সংক্রান্ত খসড়া বাতিল করা হবে।

অর্থাৎ একদিকে মৎস্যজীবিদের পক্ষে অকল্যাণকর কাজ করে যাওয়া হচ্ছে, অন্য দিকে মৎস্যজীবিদের জন্য বিশেষ কল্যাণ পর্ষদ গঠন করার কথা বলা হয়েছে। -এ কে কী বলে? দ্বিচারিতা না?

ধন্যবাদান্তে

নব দত্ত

নাগরিক মঞ্চ-র পক্ষে ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, রুম নম্বর ৭, ব্লক বি (দোতলা), কলকাতা ৭০০০৮৫ থেকে প্রচারিত ।